I J C R M
International Journal of Contemporary Research In Multidisciplinary

Research Article

সামাজিক বাস্তবতার দিক দিয়ে বাংলা সাহিত্যের সতীনাথ ভাদুড়ী এবং হিন্দী সাহিত্যের ফণীশ্বরনাথ রেণুর তুলনাত্মক বিশ্লেষণ

Bulbuli Oraon
M.A in Bengali, Cooch Behar Panchanan Barma University, West Bengal, India

Corresponding Author: *Bulbuli Oraon

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19200336

Abstract

সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬- ১৯৬৫) ছিলেন বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের একজন বিশিষ্ট বাঙালি কথা সাহিত্যিক। যিনি মূলত আধুনিকতাবাদী ধারার লেখক হিসেবে পরিচিত। তাঁর লেখায় রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং মানুষের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব, বিশেষত রাজনৈতিক বন্দি জীবন ও সমকালীন সমাজ গভীর ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর সাহিত্য কর্মের মূল পর্ব ছিল বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ, বিশেষত ১৯৪০ থেকে ১৯৬০ এর দশক। ফণীশ্বরনাথ রেণু (১৯২১- ১৯৭৭) ছিলেন প্রেমচাঁদ পরবর্তী যুগের একজন প্রভাবশালী হিন্দী লেখক এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী। যিনি মূলত 'আঞ্চলিক উপন্যাস ধারা' এর পথিকৃৎ হিসেবে পরিচিত। যেখানে তিনি গ্রামাঞ্চলের বাস্তবজীবন ও সামাজিক পরিবর্তনের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। তার সাহিত্য রচনার সময়কাল ছিল, প্রেমচাঁদ পরবর্তী যুগ, বিশেষত ১৯৪৭ সালের পর ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও পরবর্তী সময়ের প্রেক্ষাপট। বাংলা উপন্যাসিক সতীনাথ ভাদুড়ী ও হিন্দী উপন্যাসিক ফণীশ্বরনাথ রেণুর জন্ম বিহারের পূর্ণিয়াতে। উভয়ের জীবনের অধিকাংশ সময় এখানেই অতিবাহিত হয়েছে। তাই উভয়ের সৃষ্ট উপন্যাসে এই বিশিষ্ট অঞ্চলের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের জীবনচর্চা বিধৃত হয়েছে। আমি উভয়ের জীবন ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের তুলনামূলক আলোচনা ও মূল্যায়নের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে দুইজনেই আবির্ভূত হন। সতীনাথ ও ফণীশ্বরনাথের সামাজিক তুলনার প্রেক্ষাপটে ছিল রাজনৈতিক অস্থিরতা ও গ্রামীন জীবনের বাস্তবতাকে সাহিত্যে তুলে ধরা। উভয়ের লেখায় সাধারণ মানুষের জীবন, রাজনীতি ও ইতিহাসের এক মানবিক চিত্র ফুটে উঠেছে। বিশেষত ভারতছাড়ো আন্দোলনের প্রভাব নিজেদের লেখায় এনেছেন।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2583-7397
- **Received:** 13-01-2026
- **Accepted:** 23-02-2026
- **Published:** 24-03-2026
- **IJCRM:**5(2); 2026: 326-229
- **©2026, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

Oraon B. সামাজিক বাস্তবতার দিক দিয়ে বাংলা সাহিত্যের সতীনাথ ভাদুড়ী এবং হিন্দী সাহিত্যের ফণীশ্বরনাথ রেণুর তুলনাত্মক বিশ্লেষণ. Int J Contemp Res Multidiscip. 2026;5(2):326-229.

Access this Article Online

www.multiarticlesjournal.com

KEYWORDS: সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, চরিত্র, বাস্তবতা, আঞ্চলিকতা, মানুষের জীবন, স্বাধীনতা।

© 2026 Bulbuli Oraon. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

ভূমিকা

বাংলা ও হিন্দী একই মাতামহীর দুই দৌহিত্র। পরস্পরের মধ্যে অন্তরঙ্গ পরিচয় যত প্রতিষ্ঠিত হয় ততই মঙ্গল। বাংলা ও হিন্দী এই দুই প্রতিবেশী সাহিত্যে কিছু সৃষ্টি কর্তার নাম উচ্চারিত হয়ে থাকে, তার মধ্যে রয়েছেন বাংলা সাহিত্যের সতীনাথ ভাদুড়ী এবং হিন্দী সাহিত্যের ফণীশ্বরনাথ রেণু। ব্যাক্তিগত জীবনে এরা দুজনেই সমকালীন ও সমস্থানিক। উভয়ের সাহিত্যে এক আশ্চর্য ঐক্য রয়েছে। বিহারের পূর্ণিয়া অঞ্চলটি শুধু যে এদের বাসভূমি ছিল তাই নয়, এদের সৃষ্টি সাহিত্যের ও পরিবেশভূমি। একথা আমাদের মনে রাখা উচিত যে, রেণু আবাল্য সতীনাথের সংস্পর্শে ছিলেন। স্বাভাবিক কারণে সমকালীন এবং সমস্থানিক এই উভয় লেখকের সাহিত্যে সাধনার ক্ষেত্রে পারস্পরিক প্রভাব পড়ার কথা এবং সে প্রভাব আছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তারা একে অপরের নিছক প্রতিচ্ছবি। দুজনের মধ্যে মিল যেমন আছে, অমিল ও তেমনি আছে। সেই অমিলের ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য রয়েছে, তেমনি স্বাধীন প্রতিভার বিকাশ ও প্রকাশ। বাংলা ও হিন্দী সাহিত্যের এই দুই প্রতিভাবান স্রষ্টার তুলনামূলক আলোচনা শুধু উচ্চতর ক্ষেত্রে নয়, জাতীয় সংহতির পথে ও অতি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।

বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব ও শাখাবিকাশ: খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দী বা তার অল্প কিছুকাল পূর্বে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছিল। মাগধী অপভ্রংশের আচ্ছাদন ত্যাগ করে বাংলা ভাষার পথ চলা শুরু হয়। বাংলা ভাষার উৎপত্তি অনান্য আর্যভাষার মতই নদী প্রবাহের সঙ্গে তুলনীয়। নদী প্রবাহের মতো এই ভাষা যত অগ্রসর হয়েছে, তত তার পরিবর্তন হয়েছে আর তার আকার-আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে এই ভাষা চলেছে নব নব সম্ভবনার সাগরসঙ্গমে। খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দী থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত নানা পরিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বাংলা ভাষা বয়ে চলেছে। এই ভাষার বয়স হাজার বছর। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হাজার বছরের ও পুরনো। এই দীর্ঘ ইতিহাসের পিছনে গভীর ও ব্যপক প্রভাব বিস্তার করেছে সংস্কৃত, ইংরাজী ও ইসলামি সাহিত্যে। বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন চর্যাপদের সূচনা থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে তিনযুগে ভাগ করা হয়েছে, প্রচীন যুগ ৬৫০ থেকে ১২০০ সাল পর্যন্ত, মধ্যযুগ ১২০০ সাল থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত এবং আধুনিক যুগ ১৮০০ সাল খেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিস্তৃত।

প্রাচীন যুগ: প্রাচীন যুগের সূত্রপাত হয় পাল রাজত্বের আরম্ভ থেকে, শেষ হয়েছে সেন রাজত্বের পতনকাল পর্যন্ত। এই সময় কালটা ছিল অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত। বাংলা ভাষার প্রাচীনতম রূপটি পাওয়া যায় 'চর্যাপদে'। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনযুগের ইতিহাসে একটি মাত্র গ্রন্থকে স্থান দান করা যেতে পারে, তা হল চর্যাপদ। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল রাজ দরবার থেকে কয়েক খানি পুঁথি আবিষ্কার করে 'হাজার বছরের পুরানো বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা নামে এদের এক সঙ্গে প্রকাশ করেন। সকল দেশে এবং সকল যুগে দেখা গিয়েছে যে, সাহিত্য সৃষ্টির শুরু হয়েছে ধর্মকে অবলম্বন করে। ধর্মের বাহন হয়ে ও ভাষা সাহিত্যের দরবারে প্রবেশ লাভ করেছে। বাংলা যখন নবজাত শিশু, তখন বাঙালি কবির সাহিত্যে সৃষ্টির অবলম্বন ছিল সংস্কৃত। কিন্তু যারা তথকথিত পন্ডিত অথবা অভিজাত নন, যাদের কারবার সমাজ ও জাতির নিম্নস্তরের ব্যক্তিগণকে নিয়ে, যারা নিম্নস্তরের লোকের জন্য 'পদ' অর্থাৎ গান রচনা করতেন অথবা উপদেশাত্মক ছড়া কাটতেন, তাদের রচনার ভাষা তো সংস্কৃত হলে চলবে না, তারা অশিক্ষিত জন সাধারণের সহজ ভাষাতে গীত রচনা করতে বাধ্য হলেন। এমন করে তান্ত্রিক ব্রক্ষচার্য শৈব নাগাচার্য দিগের হাতে বাংলা সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন হলো। ততবধি যা আবিষ্কৃত হয়েছে, তার মধ্যে সিদ্ধচার্যদিগের সাধন তত্ত্ব জ্ঞাপক 'চর্যাপদ' গুলিতেই বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন রয়েছে।

মধ্যযুগ:- বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগটি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ত্রয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত। এই সময় প্রাচীন যুগের চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটেছে। ইখতিয়ার উদ্দিন বখতিয়ার খিলজীর আমল থেকে বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের সূচনা বলে ধরা হয়। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে তিনটি প্রধান ধারার পরিচয় পাওয়া যায়। মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব সাহিত্যে ও অনুবাদ সাহিত্যে। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য একান্তভাবে দেব নির্ভর ছিল। মধ্যযুগে (১৪ শ-১৮ শ) শতাব্দী প্রায় চার বৎসর ধরে দেবতা, দেবতার অবতার বা দেব কল্প দেবতার কাহিনী প্রাধান্য লাভ করে। এই সময়কার বাংলা সাহিত্য, রামায়ন, মহাভারত ও ভাগবতের বঙ্গানুবাদ, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলি, শাক্ত পদাবলি, পীর সাহিত্য, নাথ সাহিত্য এবং ইসলামি ধর্ম সাহিত্য ছিল এই সাহিত্যের মূল ধারা।

আধুনিক যুগ:- বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের সূত্রপাত হয় অষ্টাদশ শতকে। এই সময়ে ইংরেজদের শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইয়োরোপীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ভাবধারাই নবযুগের বুনিয়াদ গড়ে উঠেছিল। নতুনের আবির্ভাবে পুরাতনকে পথ ছেড়ে দিতেই হয়, যেমন জীবনে তেমনি সাহিত্যেও। তবে সাংস্কৃতিক জীবনে এই পরিবর্তন রাতারাতি ঘটে না, নানাবিধ জটিলতা দেখা যায়। পুরাতন কাব্যধারা বাঙালির অস্থিমজ্জায় জড়িয়েছিল, তাকে বিসর্জন দেওয়ার বাসনা সহজ কিন্তু সর্বমূলে পরিহার করা তত সহজ নয়। শিক্ষিত লেখকদের হাতে পুরানো কবিতার যথাযথ অনুসরণ ঘটল না। নবীনের দ্বারদেশে পৌঁছাবার চেষ্টা তারা করলেন। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের পর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্টা, শ্রীরাম মিশন প্রতিষ্ঠা এবং তার কিছুদিন পরে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পর শিক্ষিত বাঙালির যে মানস পরিবর্তন ঘটে, তারই প্রতিফলনে বাংলা সাহিত্যে নবযুগের প্রতিষ্ঠা।

হিন্দী সাহিত্যের পরিচয়:- হিন্দী আমাদের প্রতিবেশী সাহিত্য। খ্রিষ্টীয় দশম শতক থেকেই হিন্দী সাহিত্যের প্রারম্ভ। এই সময়কার গ্রন্থ হচ্ছে হেমচন্দ্রের 'প্রাকৃত ব্যাকরণ' মেরতুঙ্গের 'প্রবন্ধ চিন্তামনি' রাজশেখরের 'প্রবন্ধ কোষ' প্রভৃতি রচনার ভাষা অপভ্রংশ এবং লৌকিক। হিন্দী সাহিত্যের সঠিক প্রারম্ভ চতুর্দশ শতক থেকে। যদিও দশম শতক থেকেই কবিরা লোক ভাষার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন। চতুর্দশ শতক পর্যন্ত অপভ্রংশ ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি অব্যাহত ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল- বিজয় পালা রাসো, কীর্তিলতা ও কীর্তিপতাকা প্রভৃতি গ্রন্থে। এই সময়ে হিন্দী সাহিত্যের একটি বাঁক স্পষ্ট হয়ে উঠল। প্রাচীনতা থেকে পূর্ণ মুক্তি না ঘটলেও কৃত্রিমতা কমেছে। হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

আদিকাল বা বীরগাথা কাল:- প্রাকৃতের শেষ অবস্থা 'অপভ্রংশ' থেকেই হিন্দী সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছিল। অপভ্রংশ বা প্রাকৃত ভাবযুক্ত হিন্দী কবিতার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া গিয়েছিল তান্ত্রিক এবং যোগমাগী বৌদ্ধদের সাম্প্রদায়িক রচনায়। যার রচনাকাল আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক। তাই হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভবযুগ বা আদিকাল রূপে খ্রিস্টীয় দশম থেকে চতুর্দশ শতকের পরিধিকে ধরা হয়। হিন্দী সাহিত্যের আদিযুগের প্রথম পর্বের সাহিত্যের বাহন দোহা ছন্দোবদ্ধ। নীতি, শৃঙ্গার, যুদ্ধ, ধর্ম সকল বিষয়ের রচনাই দোহাতে পাওয়া যায়। রাজাশ্রিত কবি ও চারণদের দল নানাভাবে কবিত্ব করে রাজা ও রাজসভাসদদের মনোরঞ্জন করতেন, তেমনি আশ্রয়দাতা নৃপতিদের শৌর্য বীর্য কীর্তন ও করতেন। হিন্দী সাহিত্যের আদিযুগ 'বীরগাথা' নামে ও চিহ্নিত। এ যুগের অধিকাংশ রচনাতেই বীরত্ব কাহিনী, যুদ্ধ বিগ্রহ আদিস্থান পেয়েছে।

পূর্ব-মধ্যকাল ভক্তিযুগ:- হিন্দী সাহিত্যের মধ্যযুগের ব্যাপ্তি (১৪০০-১৬৫০), পরিমান এবং উৎকর্ষের বিচারে বিশেষ গৌরান্বিত হয়েছিল। এই যুগের প্রধান সৃষ্টি ছিল ভক্তিকাব্য এবং রীতি কাব্য। এই সময় আবির্ভূত হয়েছিলেন মহাপ্রভু চৈতন্যদেব (১৪৮৫- ১৫৩৩)। বৃন্দাবন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধন কেন্দ্র হয়েছিল, হিন্দী সাহিত্যে তার প্রভাব পড়ে পরবর্তীকালে। যে সব অভিনব কাব্য সৃজন শুরু হয়েছিল, তার ফলে হিন্দী সাহিত্যে নতুন বিশিষ্টতায় মন্ডিত হয়েছিল এবং সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হল। বস্তুত হিন্দী সাহিত্যের প্রারম্ভ ও সমৃদ্ধি হয়েছিল তা এই ভক্তি যুগেই লক্ষিত হয়।

উত্তর-মধ্যকাল রীতিযুগ:- হিন্দী সাহিত্যে রীতি কাব্যের যুগ সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে তা শুরু হয়েছিল। রীতিযুগের কাব্যে প্রধানত ব্রজ ভাষারই প্রয়োগ হয়েছিল। অঞ্চলের বিস্তৃতি

© 2026 Bulbuli Oraon. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

এবং কবিকুলের বহু সংখ্যকতায় তাতে প্রতিবেশী অবধি একাধিক ভাষার মিশ্রণ ঘটেছিল। শুধু তাই নয় 'যাবনিমিশল' ভাষার প্রয়োগ করেছিলেন কবিরা। সব মিলিয়ে এই সময় নানা প্রকার প্রয়োগ পরীক্ষার দ্বারা ভাষা অনুশীলনের সুযোগ ছিল। কবিও , সবৈয়া ও দোহা এযুগের কবিদের প্রিয় ছন্দোবন্ধ।

আধুনিক কাল:- ১৮৫০-১৯৮০ এই সময় হিন্দী আধুনিক কালের পথ চলা শুরু হয়। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত হিন্দী কবিতার সেই তেজ এবং শক্তি ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। যা পঞ্চদশ শতকের ভক্ত কবিদের রচনায় দেখা গিয়েছিল। জীবনের সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক অচ্ছদ্য। রীতিযুগের শেষ দিকে হিন্দী কবিতার ধারা ধরা বাঁধা পথে অগ্রসর হতে হতে ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে উঠেছিল। গভীর অনুভূতি এবং মনের আবেগ প্রকাশের অন্যতম বাহন বা মাধ্যম কবিতা। আধুনিক যুগও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু জীবনের যুগী অনুসারী সাধারণ প্রয়োজন যে কঠোরতা, উগ্রতা জটিলতা নিয়ে আসে, তার জন্য গদ্য আশ্রয় নেওয়াই স্বাভাবিক। ফলে আধুনিক যুগে মানব মনের সার্থক এবং সুস্পষ্ট অভিব্যক্তির মাধ্যম ছিল গদ্য। হিন্দী গদ্যর প্রাচীনতম নিদর্শন রূপে গোর্খপন্থী সাধন গ্রন্থের উল্লেখ করা যায়। তা খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতকের রচনা বলে অনুমিত হয়।

বাংলা সাহিত্যিক সতীনাথ ভাদুড়ী:- কোন শিল্পী সাহিত্যিকের সৃষ্ট শিল্প সাহিত্যকে আলোচনা করতে গেলে এসে যায় সেই শিল্পী সাহিত্যিকের জীবন। কোন সাহিত্যিকের সৃষ্টিকে জানতে হলে, সৃষ্টা তথা ব্যক্তি মানুষটিকে না জানলে তার সৃষ্টিকে জানা সম্পূর্ণ হতে পারে না। কারণ প্রত্যেক শিল্পী সাহিত্যিকের সৃষ্টির পিছনে থাকে তার ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞানতা অনুভব উপলব্ধি। তাই ব্যক্তি মানুষটিকে উপেক্ষা করে তার সাহিত্যকে মূল্যায়ন করা সম্ভবপর নয়। সাধারণ ভাবে কবি এবং সাহিত্যিকদের জীবন বিধৃত থাকে তার লেখার মধ্যে। নিজের বিষয়ে যারা নিরব থাকতে ভালোবাসেন, নিভৃতে, নিরবে যারা সাহিত্য সাধনা করেই তৃপ্তি পান, জ্ঞান তাপস থেকে আত্মমগ্নতার সাধনায় নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে যান, এমন মানুষই সাহিত্যের ক্ষেত্রে ছিলেন সতীনাথ ভাদুড়ী। সতীনাথ ভাদুরী এমন একজন ছিলেন, যিনি নিজের সম্পর্কে খুব কম কথাই বলেছেন। তার ডায়রিতে ও ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ বেশী কিছু নেই। বন্ধু বান্ধব এবং পরিজনদের থেকেও তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ আড়াল করে রেখেছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে সতীনাথ ভাদুড়ী শক্তিমান উপন্যাসিক। সতীনাথ ভাদুড়ীর জন্ম উত্তর বিহারের পূর্ণিয়া জেলার 'ভাট্টবাজার' এ। ১৩১৩ সালের বিজয়া দশমীর দিন ১১ই আশ্বিন। সতীনাথের পিতা ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী এবং মাতা রাজবালাদেবী। সতীনাথের অগ্রজ দুই ভাই হলেন শিবনাথ এবং ভূতনাথ। আট ভাই বোনের মধ্যে লেখক ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। সতীনাথের জন্মস্থান পূর্ণিয়া হলেও তাদের আদি বাসস্থান ছিল কৃষ্ণ নগরে। সতীনাথের কৃষ্ণনগরের বংশ বেশ অভিজাত এবং সমৃদ্ধশীল পরিবার ছিল। সতীনাথের পিতামহ শশীর খাঁ ভাদুড়ী ধনী মালী প্রতিষ্ঠিত গৃহস্থ ছিলেন। পূর্ণিয়া জেলা স্কুলে সতীনাথের লেখাপড়া শুরু হয়। সতীনাথের বিশেষ নাম ছিল মেধাবী ও কৃতী ছাত্র হিসাবে। সতীনাথ লেখাপড়ায় উৎসাহ, প্রেরণা পেতেন মার কাছ থেকে। সতীনাথ ছিলেন মাতৃ ভক্ত। সতীনাথের জীবন ছিল মাতার স্নেহে সিঞ্চিত। ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় সতীনাথ উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চ শিক্ষার্থে পাটনায় গিয়েছিলেন। অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে দ্বিতীয় বিভাগে বি. এ. অনার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন পাটনা কলেজ থেকে। এম. এ. পাস করেন দ্বিতীয় বিভাগে অর্থনীতিতে ১৯৩০ সালে।

১৯৩১ সালে পাটনা আইন কলেজ থেকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তার পর তিনি পূর্ণিয়ায় ফিরে আসেন এবং পিতার সহকর্মী হিসাবে কাজে যোগদান করেন। পূর্ণিয়ায় ফিরে আসেন ও ওকালতি করেন (১৯৩৩- ১৯৩৯) সাত বছর। সতীনাথের ঝোঁক বেশী ছিল পড়াশুনার দিকে। লাইব্রেরীতে গিয়ে গভীর মনোযোগে পড়াশুনা করতেন। ১৯৩৯ এর পূর্বে সতীনাথ ভাদুড়ী প্রত্যক্ষ ভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েননি, ১৯৩৯ এর আগে ছাত্র থাকা কালীন সমাজ সেবামূলক কাজ করেছিলেন। তিনি নিজেও গান্ধীবাদে দীক্ষিত হয়েছিলেন। এর মূলে ছিল ১৯২১ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত ভারতের রাজনীতিতে সাড়া জাগানো আবির্ভাব ঘটে গান্ধীজির। সেই সময় সতীনাথ ভাদুড়ী ছিলেন ছাত্র। তার পর ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের হাতিয়ার হিসাবে, অহিংস সত্যাগ্রহতে অংশ গ্রহণ করে, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেন। মানুষের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ মানব জীবনের প্রতি অপার রহস্য এবং দেশের হয়ে কাজ করবার নেশা তাঁকে বারবার ঘরের বাইরে নিয়ে এসেছিল। সতীনাথ ভাদুড়ী পরিণত বয়সে, আকস্মিক ভাবেই যোগদান করেন রাজনীতিতে। জীবন সম্পর্কে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত নিয়েই তিনি রাজনীতিতে পুরোপুরি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সতীনাথের রাজনৈতিক জীবনের বিস্তৃতি নয় বছর (১৯৩৯-৪৮) এর মধ্যে কারাবরণ করেছিলেন তিনি তিন বার। পূর্ণিয়া জেলে প্রথম কারারুদ্ধ হন, ১৯৪২ এর আন্দোলনে। এই সময় কারা জীবনের সঙ্গী ছিলেন ফণীশ্বরনাথ রেণু। তিনি হিন্দী সাহিত্যের বিখ্যাত উপন্যাসিক। 'ভাদুড়ীজী' শীর্ষক স্মৃতি রচনায় ফণীশ্বরনাথ সতীনাথের জেল জীবনের অনেক ঘটনা প্রকাশ করেছিলেন। ফণীশ্বরনাথকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছিল জেল জীবনের সতীনাথের 'জীবনচর্যা' – "সতীনাথের প্রকৃত সাহিত্যে জীবন শুরু হয়েছিল, রাজনৈতিক জীবন শেষ হওয়ার প্রাক্কালগ্নে। স্বাধীনতা লাভের পরেই তিনি আকস্মিক ভাবেই কংগ্রেসী রাজনীতি ত্যাগ করেন। পরে তিনি দীর্ঘকাল নিরবিছিন্ন থেকে সাহিত্যে সাধনা করেন। সাহিত্য বাসরে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন অনেকটা পরে"

সতীনাথ ভাদুড়ীর সাহিত্য চর্চার কাল বিশ বছর (১৯৪৫- ১৯৬৫)। এই সময়ের মধ্যে তিনি ছ-খানি গল্প গ্রন্থ, দু-খানি উপন্যাস আর জার্নাল জাতীয় একটি ভ্রমন গ্রন্থ রচনা করেন। তার উপন্যাস গুলির মধ্যে 'জাগরী' ১৯৪৫, 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' ১৯৪৯, 'ঢোড়াই চরিত মানস' প্রথম খন্ড ১৯৪৯ এবং দ্বিতীয় খন্ড ১৯৫১, 'অচিন রাগিণী' ১৯৫৪, 'সত্যি ভ্রমন কাহিনী' ১৯৫১, 'দিগভ্রান্ত' ১৯৬৬, 'সংকট' ১৯৫৭, গল্পগ্রন্থ 'গণনায়ক' ১৯৪৮, 'অপরিচিতা' ছোট সংকলন- ১৯৫৪ 'চকাচকী' (ছোট গল্প সংকলন ১৯৫৬), 'পত্র লেখার বাবা' (ছোট গল্প সংকলন ১৯৬৪)।

পূর্ণিয়া জেলা স্কুলে অনুষ্ঠিত শতবার্ষিকী, সংখ্যায় প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে রচিত স্মৃতি কথায় সতীনাথ লিখেছিলেন- "আমি ঘরে যাবার দেড়শ বছর পরে, আমার পোঁতা গাছ স্কুলের সৌন্দর্য বাড়াবে, এভাবে ভাবতে পারেন কজন শিক্ষক? জ্ঞান সুরুচি দূরদৃষ্টি, কর্তব্যনিষ্ঠা ছাড়াও এর জন্য দরকার হয় আত্মবিলোপনের ক্ষমতার" এই আত্মবিলোপনের সাধনায় তিনি নিজে আজীবন মগ্ন ছিলেন। গুণমুগ্ধ সাহিত্যিক বিমলকর তাঁর সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন "সংস্কৃতির পীঠস্থানে প্রণামী ফেলতে আসার লোক তিনি নন" স্বভাব লাজুক সংযত বাক সতীনাথ ভাদুড়ী সম্পর্কে হিন্দী সাহিত্যিক ফণীশ্বরনাথ রেণু মন্তব্য করেছিলেন- "আমি দুই মাসে যত কথা জেলে বলেছিলাম, ভাদুড়ীজী তিন বছরের মধ্যে ওর চেয়ে অনেক কম কথা বলেছিলেন নিশ্চয়ই"।

৫৯ বছর বয়সে সতীনাথের মৃত্যু ঘটে। ১৯৬৫ সালের ৩০ শে মার্চ হার্টের উপর টিউমার ফেটে, ১৯৫২ সালের জুলাই মাসে হঠাৎ একদিন বুকে ব্যথা অনুভব করেন সতীনাথ। সতীনাথকে বিদেশে চিকিৎসা করানোর কথা বলা হয়। কিন্তু সতীনাথের বিদেশে চিকিৎসা করানোর ইচ্ছা ছিল না। তিনি যেন জানতেন ও অনুভব করেছিলেন এই রোগেই তার জীবন শেষ হবে। অবশেষে ঘনিয়ে আসে সতীনাথের জীবনে সেই দিন। ১৯৬৫ সালের ৩০ শে মার্চ সকালে তার নিজের বাড়ী পূর্ণিয়ার ভাট্টাবাজারে পড়ে গিয়েছিলেন কুয়োর পাশে, টিউমার ফেটে মারা যান সতীনাথ। প্রজ্ঞাদীপ্ত মিতবাক, শিল্প সচেতন, মহান লেখক সতীনাথ পৃথিবীর বুক থেকে চিরবিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

হিন্দী সাহিত্যিক ফণীশ্বরনাথ রেণু:- হিন্দী সাহিত্যিক ফণীশ্বরনাথ রেণুর ব্যাক্তিগত জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভাবে জীবন পঞ্জী রচনা করার মতো তথ্য পাওয়া যায় না। তার সত্যানুরাগী বন্ধুদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য এবং তার স্ত্রী শ্রীমতী লতিকা রেণুর থেকে পাওয়া তথ্যর উপর ভিত্তি করে, তার শিল্পী মানসের পরিচয় সন্ধান করলে দেখা যায়, ফণীশ্বরনাথ রেণু সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী, বিশেষত বাংলা ও ইংরেজী সাহিত্যের অনুরাগী, সমাজ-অর্থনীতি সচেতন, স্বকীয় চিন্তা, শিল্প ভাবনার স্বয়ংক্রিয় সাহিত্যিক ছিলেন। এই চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য গুলির অনেকটাই সতীনাথের থেকে পাওয়া, যা তাকে সাহিত্যিক জীবনের সার্থকতায় এগিয়ে নিয়ে গেছে, মানবিক বোধসম্পন্ন শিল্প চেতনার সামগ্রিকতায়।

© 2026 Bulbuli Oraon. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

১৯২১ খ্রিষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ বিহার প্রদেশের পূর্ণিয়া জেলার 'ঔরাহী হিঙ্গনা' নামক গ্রামে জন্ম হয় ফণীশ্বরনাথ রেণুর। তার পিতা সহৃদয় কৃষক ছিলেন। ফণীশ্বরনাথের পিতা বাবু শীলানাথ কুর্মাক্ষত্রিয় বংশের সম্পন্ন একজন ছিলেন। ভৌগলিক দিক দিয়ে যায় পূর্ণিয়ার একদিক নেপালের সঙ্গে যুক্ত। ফণীশ্বরনাথ রেণুর পরিবারে বংলা ও মিথিলা সংস্কৃতির অনের প্রভাব ছিল। ছোট খাটো শিল্প নগরীরূপে বিকশিত হয়েছিল, সেই সময় ফারবিসগঞ্জ। পূর্ব নেপালের বিরাট নগর অতি নিকটে ছিল ফারবিসগঞ্জের। পাহাড়ী পথে দার্জিলিং ও বেশী দূরে নয়। মিথিলার এই অঞ্চল নেপাল এবং বাংলাদেশের সীমান্তে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলপথ (এন. ই. এফ. আর) এর উপর রেণুর গ্রাম 'উরাহী হিঙ্গনা' সিমরাহা স্টেশনের কাছে ফারবিসগঞ্জ থেকে ২০ কিলোমিটার দক্ষিণে। আমের বাগান এবং সবুজ খেতের মধ্যে অবস্থিত।

ফণীশ্বরনাথ রেণুর প্রাথমিক শিক্ষা দীক্ষা গ্রামেরই বাংলা নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাঙালি শিক্ষকের কাছে সম্পন্ন হয়। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর বিরাট নগর স্কুলে ভর্তি হন। এর পর বিরাট নগর স্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অরবিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। অরবিয়া উচ্চ বিদ্যালয়টি রামকৃষ্ণ মিশনের। রামকৃষ্ণ মিশনের আচার, নিষ্ঠা, সেবাধর্মী সন্ন্যাসীদের জীবন যাত্রা প্রণালী তার মনে বিশেষ প্রভাব ফেলে, যার সম্বন্ধে 'কিতনে চৌরাহে' নামক উপন্যাসে উল্লেখ করেছেন।

হিন্দী কথা সাহিত্যের জগতে ফণীশ্বরনাথ রেণুর জীবনচর্চা ছিল বৈচিত্র্য পূর্ণ। তার প্রথম গল্প 'বটবাবা'। ফণীশ্বরনাথ রেণুর প্রথম পরিচয় রাজনীতিক কর্মী রূপে, আগে তিনি রাজনীতিবিদ পরে সাহিত্যিক। ১৯৫৩ সালে তিনি রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছিলেন, পরে তিনি ১৯৭১ পর্যন্ত নিরবিছিন্ন ভাবে সাহিত্য সাধনা করেন। এই সময়েই গ্রামীন জীবনের পটভূমিকায় তার রচনা 'তিসরী কসম' 'টুমরী ১৯৫৯', 'আদিম রাত্রি কী মহক' ১৯৬৭ এবং 'অগিনখোর' ১৯৭৫ ইত্যাদি বিখ্যাত গল্প সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। ফণীশ্বরনাথের 'তিসরী কসম' গল্প নিয়ে শৈলেন্দু ফিল্ম তৈরি করেন ১৯৬১-৬৫ তে, যা পরে হিন্দীতে শ্রেষ্ঠ ফিল্ম হিসাবে 'স্বর্ণ পদক' লাভ করে। এর পর রেণু তার সর্ব শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'মৈলা আঁচল' ১৯৫৪, 'পরতী পরিকথা' ১৯৫৭, 'দীর্ঘতপা' ১৯৬৩, 'জুলুস' ১৯৫৬, 'কিতনে চৌরাহে' ১৯৫৬, 'নেপাল ক্রান্তিকথা' ও 'পল্টুবাবু রোড়' ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত হয়।

১৯৭৬ এর নভেম্বর পর্যন্ত গ্রামে থাকাকালীন রেণু যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন তাকে অচেতন অবস্থায় আনা হয় পাটনায়। তিনি পেপটিক আলসারের পুরানো রোগী ছিলেন। অপারেশন করার প্রয়োজন ছিল অনেক দিন এড়িয়ে গিয়েছিলেন তিনি। পরে যখন অপারেশন করা হয়, তখন তিনি আর জ্ঞানে ফেরেননি। এই মহান সাহিত্যিক, বিপ্লবি নিজের মৃত্যুকে স্বার্থক করে না ফেরার দেশে চলে গেছেন, পায়ে হেঁটে একাই, যাঁর রাস্তা 'মৈলা আঁচল' এবং 'পরতি পরকথা' হয়ে যায়।

জন্ম এবং কর্মসূত্রে উভয়েই উত্তর বিহারের ছিলেন ফলে ঐ অঞ্চলের পথ ঘাট প্রান্তর জনজীবন ও তাদের প্রতিনিয়ত বিচিত্র্য জীবনচর্চায় ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িয়েছিলেন। স্বাধীনতার সময় যেমন সতীনাথ রাজনীতির সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে গভীর সাহিত্য চর্চায় মগ্ন হয়েছিলেন। তেমনি ফণীশ্বরনাথ ও রাজনীতি থেকে সরে গিয়ে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। এই ভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করলেও তাদের কাছাকাছি যেসব সাধারণ মানুষ ছিলেন তাদের মধ্যে কেউই দুজনের মন থেকে অপসৃত হননি। দুজনেই ঐসব মানুষের জীবন যাপন, আচার আচরণের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে নিয়েছিলেন। তাই উভয়ের সৃষ্ট উপন্যাস গুলিতে সেই সব মানুষের জীবনচিত্র গভীর মমতায়, অপরিসীম শ্রদ্ধায় এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠায় উদ্ভাসিত হয়েছে। তাদের সহজ সরল জীবন যাপন প্রতিনিয়ত জীবন যাপনের অভাব অনটন, শক্তিমানের প্রতি আনুগত্য, সংস্কার ইত্যাদি সব কিছুকেই উষ্ণ আবেগে সতীনাথ এবং ফণীশ্বরনাথ তাদের সাহিত্যে কর্মে স্থান দিয়েছেন।

এরা উভয়েই স্বভাবশিল্পী ছিলেন। কোন কষ্টার্জিত রীতিসিদ্ধ প্রয়াস বা আরোপিত কোন চিন্তাধারা এদের রচনায় দেখা যায়নি। তবু রেণু সতীনাথ অপেক্ষা অনেক বেশী সমাজ সচেতন লেখক ছিলেন। অনুরূপে রেণু তার রচনাগুলিতে সৃষ্টিশীলতাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। সতীনাথ ও বিদগ্ধ মননশীল লেখক ছিলেন। কিন্তু তার বৈদগ্ধ কখনই শিল্পচেতনাকে আচ্ছন্ন করেননি। এছাড়া মানব প্রেমের ক্ষেত্রেও উভয়ের সৌসাদৃশ্য লক্ষণীয় ছিল। মানুষের প্রতি প্রগাঢ় দরদ দুজনেই স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে প্রকাশ করেছিলেন। রেণুর মানবপ্রেম সহজ অনাড়ম্বর প্রকৃতি ধর্মী। সতীনাথের ক্ষেত্রে এই মানবপ্রেম ব্যাপকতর পরিধিতে ব্যাক্ত ছিল।

উপসংহার:- বাংলা ভাষার সাহিত্যিক সতীনাথ ভাদুড়ী এবং হিন্দী ভাষার সাহিত্যিক ফণীশ্বরনাথ রেণু উভয়েই ছিলেন মানবতার পূজারী। দুজনেই সাহিত্যে মানবতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বৃহত্তর সমাজবোধে ভাবিত হয়ে ভাদুড়ী ও রেণু আমাদের সমাজ জীবনের অসঙ্গতিকে তীব্র আঘাত হেনেছেন। উভয়েই সংযত হৃদয়াবেগে সমগ্র ভারতবর্ষকে আপন করে নিয়েছেন। উভয়ের মূল সাহিত্যে প্রেরণার শিকড় প্রোথিত হয়েছিল উত্তর বিহারের বিশিষ্ট অঞ্চলের রুক্ষ প্রকৃতি এবং তার মধ্যে প্রতিপালিত অনগ্রসর জনজাতি মানুষ গুলির জীবন চরণের মধ্যেই। সতীনাথ ভদুড়ী ও ফণীশ্বরনাথ রেণু উভয়েই বিহারের পূর্ণিয়া জেলাতে জন্ম ও বেড়ে ওঠা। কর্মস্থল এবং সাহিত্যে সাধনা, এমনকি উভয়ের মৃত্যু ও ঘটে বিহারেই। সতীনাথ যেমন যৌবনে স্বদেশী আন্দোলনের সাথে জড়িত থেকে অনেকবার কারাবরণ করেছিলেন, রেণু ও ছাত্র জীবন থেকে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে কয়েকবার কারাবরণ করেন। দুজনেই রাজনৈতিক জীবনের মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষের অনেক কাছাকাছি ছিলেন।

তথ্যসূত্র

1. বেরা ড, নন্দকুমার. সতীনাথ ও ফণীশ্বরনাথ ব্যক্তি ও শিল্প. পুস্তক বিপণি ২৭ বেনিয়াটোললেন, কলিকাতা-৯.
2. ভট্টাচার্য্য শ্রীঅরূপকুমার. সতীনাথ ভাদুড়ী জীবন ও সাহিত্যে. পুস্তক বিপণি ২৭ বেনিয়াটোললেন, কলিকাতা-৯.
3. বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত. মডার্ণ বুক এজেন্সি, কলকাতা; পুনর্মুদ্রণ, ২০০৭.
4. ভট্টাচার্য্য শ্রীপরেশচন্দ্র. বাংলা সাহিত্যের পরিচয়. ইন্ডিয়ান প্রোগ্রেসিত পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ ২০৬, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬, পৃষ্ঠা-১৭.
5. সেন শ্রীসুকুমার. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস.
6. গুপ্ত ক্ষেত্র. আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস. প্রথম প্রকাশ- ১৭ আশ্বিন, ১৩৬৭. প্রকাশক: শ্রীপ্রেমময় মজুমদার ৪৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯.
7. হালদার গোপাল. বাঙলা সাহিত্যের রূপ-রেখা. এম এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং, প্রাইভেট লি: ২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২.
8. তেওয়ারী রামবহাল. হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস. বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন বিভাগ, শান্তিনিকেতন; প্রকাশ মাস-১৩১৫. প্রকাশক-সুব্রত চক্রবর্তী.
9. কলিকাতা লিটন ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র. ১৮/এম, ট্যার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯.

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-Commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. This license permits sharing and redistribution of the article in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted under this license.

About the corresponding author

Bulbuli Oraon holds an M.A. in Bengali from Cooch Behar Panchanan Barma University, West Bengal, India. She is passionate about Bengali literature, language, and cultural studies, and is dedicated to research, teaching, and promoting literary scholarship. Her work focuses on preserving and analyzing regional literary traditions.

© 2026 Bulbuli Oraon. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/